OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 523 - 529
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 523 - 529
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা : সনাতন ও পাশ্চাত্যের গতিশীলতার মেলবন্ধন

ড. শৌভিক কুন্ডু
সহকারী অধ্যাপক
কবি নজরুল কলেজ, মুরারই, বীরভূম
Email ID : kundusouvik515@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Pedagogy, Technical Education, Indian Philosophy, Western Philosophy, Scientific Schopenhauer, Darwin theory, Buddhist Philosophy,

Abstract

Vivekananda's concept of life does not allow for absurdity. Prior to accepting anything, he used to judge everything. Whether it's science or faith. Superstition is the acceptance of something without question. Granted, no scientific finding can be considered the ultimate or everlasting word. Due to the fact that fresh hypotheses constantly alter established beliefs. Therefore, reason should be used to embrace science if it is to be believed. Science and religion are two things that cannot be followed blindly. It is from this that Swami Vivekananda's educational philosophy takes on new meaning.

Even in his personal life, Swami Vivekananda blended Western and Eastern ideas. Therefore, he found it quite easy to compare thought and language-literature. After much research, he concluded that we do not require as much philosophical and educational adoption from the West. On the contrary, it offers much. We have ideas that can greatly enrich the West. Additionally, it is simple to turn to our past for inspiration when trying something new in philosophy or writing.

His educational concept encourages people to accept what is right rather than insisting on rote information. The old Indian educational system should be adhered to the fullest extent feasible, and the traditional pace of education should be preserved. He felt that all forms of spiritual and divine education in our nation should be placed under our supervision. Apart from that, though, he feels that a strong scientific background is essential for the nation's advancement. For a heroic India will emerge if the speed of truth found in traditional education and the speed of western scientific consciousness can be appropriately combined. The welfare of the nation depends on this education policy. It is a novel method of teaching that uses judgment and reasoning to establish right and wrong without accepting any one of them as true. Vivekananda's idea of education does not extend only to making clerks. He wants education that will make people. People who will sacrifice themselves for altruism.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 523 - 529
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

(১)

সময় এগিয়ে যায় নিজের ইচ্ছে মত। মাটির পৃথিবী প্রতি দিন নিজের স্বপ্নকে বুকের ভেতরে সযত্নে লালন করে। দিন কাটায় নিজেকে নিয়ে। চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছে–অনিচ্ছে সব কিছু আবর্তিত হয় নিয়ন্ত্রা শক্তির হাতে। আর ক্রমাগত ঘাসে মুখ লুকাতে চাওয়া ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্ম ছুটে চলে চাকরির প্রত্যাশায়, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সর্বত্র শুধুই ইঁদুর দৌড়। কে কাকে পিছনে ফেলবে তার দর কষাকষি চলছে সব সময়। সহপাঠী নামক শব্দটা আজ নেহাতই গল্প। মানবিক ইচ্ছে গুলোকে প্রতি মুহূর্তে শেষ করার চক্রান্ত চলছে। শিক্ষা আজ বহন বা বাহন কিছুরই জিনিস নয়, শিক্ষা মানে শুধুই নম্বর। আর সব শেষে একটা চাকরি, যাতে নিজের জীবনে আসে স্বচ্ছলতা। এর বাইরে আমাদের কিছু ভাবতে দেয় না আজকের শিক্ষা নীতি। সেই ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মধ্যে দিয়ে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ আমাদের মধ্যে এসেছে তাতে শুধুই কেরানি তৈরি হয়, জীবনের পাঠ থাকে না। দু-শতাব্দী পেরিয়ে এসেও আমরা সেই একই ভুল করছি। গোড়ায় গলদটা থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যা করছি তা যে যথেষ্ট নয় সেটা আজ প্রবল ভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। এটাকে হাতিয়ার করে চলছে রঙের খেলা, চলছে নানা বিবাদ বিতর্ক। যা শিক্ষার উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে যাচ্ছে। ভাবনা ও পরিকল্পনার অভাব আছে এমনটা নয়। কিন্তু কীভাবে একে করে তোলা যায় উন্নয়নের সোপান, তার প্রয়োগগত খামতি একটা থেকেই যাচ্ছে। আর তাই আজ খুব বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনার কাছে আশ্রয় কামনা।

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার অনেকগুলি দিক আছে। শিক্ষার বাহ্যিক উপকরণ থেকে শুরু করে পদ্ধতি, সিলেবাস সমস্ত কিছু নিয়ে অতি সূক্ষ্ম চিন্তা ধরা পরে তাঁর বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজি প্রবন্ধে, বক্তৃতা এবং চিঠি-পত্রে। তবে তাঁর সমস্ত ভাবনার উৎসমূল হল একটাই, যে আদর্শকে সামনে রেখে আজ প্রবাহিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাভাবনা। সেটা হল প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সাথে সাথে সনাতন ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের চর্চা। বেলুড় গ্রামে বেড়াতে বেড়াতে প্রেমানন্দ মহারাজকে স্বামীজী এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বিষয়টা শুনতে যততা সহজ আদতে ততটা সহজ নয় বরং একটু বেশিই জটিল। আজ আমরা দেখতে পাই নিজের শিকড়ের সন্ধান না করে আমরা ক্রমশ অপরেরটুকু নিয়ে মত্ত হয়ে আছি। তুলনামূলক ভাবনা নির্মান করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মোহে এততাই আচ্ছন্ন হয়ে উঠছি যে বোঝার চেষ্টাই করি না আমাদেরও কিছু আছে যা গ্রহণ করা বিশেষ ভাবে দরকারি। বরং এই বিশ্বাস আমাদের ঘিরে ধরছে পাশ্চাত্যের যা কিছু তাই ঠিক আর আমাদের যা আছে তাই ভুল। আমরা মনে করে থাকি বোধ হয় এটাই আধুনিক চেতনা। কিন্তু আদতে সত্যিটা কি তাই? স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তিনি এই শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন,

> "অমুক ঋষি বা তমুক মহাপুরুষ বলিয়াছেন অতয়েব ইহা বিশ্বাস কর' – এইরূপ বলাতে যদি ধর্মসকল উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিকতর উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ ও ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যস্পদ হয়; কিন্তু হাকসলি, টিন্ডল বা ডারুইনের নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে নির্বিচারে গলাধঃকরণ করে। 'হাকসলি এই কথা বলিয়াছেন' – অনেকের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত; আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে।"[১]

- বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে স্বামীজী বিজ্ঞানের বিরোধিতা করছেন। তিনি যে কত বড় বিজ্ঞান সাধক ছিলেন তার পরিচয় পরে দেওয়া যাবে, তবে তার আগে দেখতে হবে এখানে তিনি কি বলতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দের জীবন দর্শনে কোথাও যুক্তিহীনতার স্থান নেই। প্রতিটা বিষয়কে তিনি বিচার করে তবেই গ্রহণ করতেন। তা সে ধর্মই হোক কিংবা বিজ্ঞান। আর কোনো কিছুকে বিচার না করে গ্রহণ করার নামই তো কুসংস্কার। এটা তো ঠিকই যে বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই সম্পূর্ণত ধ্রুব সত্যি বা শাশ্বত সত্যি বলে মানা যায় না। কারণ যখনই নতুন

তত্ত্ব আবিষ্কার হয় তখন পুরাতন ধারণা বদলে যায়। তাই বিজ্ঞানকেও যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা উচিত। ধর্মের মতকেও যেমন নির্বিচারে মানা যায় না, বিজ্ঞানকেও নয়। এখান থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনার নতুন তৎপর্য আমরা পাই।

বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা কেবল কেরানি বানাবার জন্য ব্যাপিত নয়। তিনি চান এমন শিক্ষা যাতে মানুষ তৈরি হবে। এমন মানুষ, যারা পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো অন্তঃস্বার শূন্য। তিনি তাই ধিক্কার দিয়ে বলেছেন,

> "কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্টু উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি – এই তো! এতে তোদেরি বা কি হলো, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ওই শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? – কখনো নয়।"[২]

বিবেকানন্দ কথাগুলি বলেছেন আজ থেকে শতাব্দী প্রাচীন আগে। কিন্তু সেই একই সমস্যাতে তো আমরা আজও জর্জরিত। সরকারি চাকরি'ই তো আমাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছে। এর বাইরে আমাদের ভাবনার বিস্তার নেই। মানুষের কথা আজকাল নাকি বোকারা ভাবে এমন কথাও শোনা যায়। আর সত্যিই যদি কেউ তা করে তবে তাতেও তাঁর স্বার্থ আছে কিনা খোঁজার চেষ্টা চলে প্রতিনিয়ত। তিনি চান এমন শিক্ষা, যার দ্বারা দেশের মানুষ স্বনির্ভর, আত্মনির্ভর হতে পারবে। তাই এর পরেই তিনি বললেন,

> "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর – চাকরি-গুখরি করে নয় – নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার করে।"[৩]

বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন সেখানে কারিগরি শিক্ষাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ কেবল চাকরি করেই দেশের উন্নতি হবে না, পাশাপাশি এই বিরাট দেশের প্রচুর জনসংখ্যার নিরিখে দেখলে এই জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব খুব সহজেই বুঝতে পারি আমরা। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ৭ম সংখ্যায় তিনি তাই লেখেন,

> "আমাদের চাই কি জানিস – স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর সায়েন্স (বিজ্ঞান) পড়ানো, চাই technical education (শিল্পশিক্ষা), চাই যাতে industry (শ্রমশিল্প) বাড়ে, লোকে চাকরি না করে দুপয়সা করে খেতে পারে।"[৪]

অর্থাৎ কেবল পরমুখাপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে না। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিজের কাজ নিজেই ইচ্ছে মত নির্বাচন করতে পারবে। কারও দাসত্ব করতে হবে না। কারিগরি শিক্ষার এই আদর্শ কিন্তু ভারতবর্ষের সৃষ্টি নয়। এর উদ্ভব থেকে বিকাশ সবটাই পাশ্চাত্যে। মনে রাখা দরকার এই মানুষটিই ছেলেবেলায় যে দুটি বিষয় চর্চা করতে চাইতেন না সে দুটি হল – গণিত ও ইংরাজি। তিনি মনে করতেন গণিত হল 'মুদির দকানের বিদ্যে'[৫] আর ইংরাজি 'ম্লেচ্ছ ভাষা, ওটা পড়তে নেই'[৬]। কিন্তু গোটা পাশ্চাত্যকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন তাঁর অসামান্য ইংরাজি ভাষাতেই। একাধারে সনাতন শিক্ষার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি প্রবল ভাবে উদ্যোগী, পাশাপাশি বিদেশী শিক্ষার মূল ভাবকে গ্রহণের পক্ষে সওয়াল করছেন তিনি। আপাত এই বৈপরীত্যকে মেলাবার ইচ্ছে বিবেকানন্দের মনে জন্ম নিল কবে কখন সেটা একটু দেখা দরকার।

(২)

আর পাঁচজন বাঙালি শিশুর মতই নরেন্দ্রনাথেরও বেড়ে ওঠা রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়ে। দেবদেবীর স্তোত্র আবৃত্তি করতেন, মুগ্ধবোধ ব্যকরণের সব সূত্র করেছিলেন কণ্ঠস্থ। এর পাশা পাশি আর একটি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জন্মায় সেটি হল ইতিহাস। প্রবেশিকা পাশের আগেই তিনি অনেক ইতিহাস বই পড়ে ফেলেন। ছোটোবেলায় পড়েছেন মার্শম্যান,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 523 - 529
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এলফিনস্টোন প্রভৃতি ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস। এই আগ্রহের কারণেই প্ররবর্তী কালে তিনি গ্রীনের লেখা ইংরেজ জাতির ইতিহাস, অ্যালিসনের ইউরোপের ইতিহাস, কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস এবং গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। শুধু পাঠ ই করেননি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই লন্ডনে সন্ত্রাসবাদী নেতা ক্রপটকিন-এর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি সন্ত্রাসবাদী ও তার প্রয়োগ নিয়েও ভেবেছিলেন, এর পরিচয় আছে 'Caste Culture & Socislism' গ্রন্থে।

এর সাথেই তাঁর আগ্রহ ছিল ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে। পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চা যতটা কলকাতায় থেকে করা সম্ভব ছাত্র বয়েস থেকেই চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এফ.এ পড়ার সময় তিনি ন্যায়শাস্ত্রের পড়েন ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম ও স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি। জার্মান দার্শনিক কান্ট, ফিকটে, হেগেল, সোপেনহাওয়ারের মতবাদও তিনি মনোযোগ সহকারে পড়েন।[৭] পাশাপাশি চলতে থাকে বৌদ্ধ দর্শনেরও চর্চা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারি বরানগর মঠে থাকবার সময় তিনি 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বিষয়ে পাঠ দেন গুরুভাইদের। প্লেটোর তত্ত্বের সাথেও তিনি পরিচিত হন। মহেন্দ্রনাথ ও অভেদানন্দকে তিনি প্লেটোর 'ফিডন' পড়িয়েছিলেন। উবেরওয়েগের দর্শন পড়াও শেষ করেন। গ্রীক ও জার্মান দর্শন শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক বিষয় তিনি মহেন্দ্রনাথের সাথে তুমুল আলোচনাও করেন। স্পেনসারের 'এডুকেশন' নামক বইটি তিনি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন বসুমতি সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে।

ছোটোবেলা থেকেই রামায়ন মহাভারতের চর্চার পাশাপাশি পাড়ে ফেলেছিলেন পুরানের গল্পগুলিও। কলেজে পড়ার সময় পড়তে শুরু করেন প্রধান প্রধান ভারতীয় দর্শন গুলি। শিখছিলেন সংস্কৃত ভাষাও। সন্ন্যাস গ্রহণের পড়ে এই সংস্কৃত চর্চা আরো বৃদ্ধি পায়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এই ছয় দর্শনেই তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বরাহনগর মঠে থাকা কালীন প্রমদাদাস মিত্রের কাছে তিনি একটি চিঠি লেখেন। সেখান থেকে জানতে পারি সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষা তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করছেন। সালটা ১৮৮৬-র ১৯-এ নভেম্বর। তিনি লিখলেন,

> "বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান রামকৃষ্ণের সমুদয় সন্ন্যাসিশিষ্যমন্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ...পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতয়েব, পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূরণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। ... আপনি বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে 'অষ্টাধ্যায়ী' সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাই দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন।"[৮]

নিজের জন্য শুধু নয় তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের জন্যও স্বামীজী সংস্কৃত ব্যাকরণ ভিক্ষা করছেন। জয়পুরে যখন ছিলেন তখন পন্ডিতের কাছ থেকে তিনি অষ্টাধ্যায়ি শেখেন। পোর বন্দরে বেদজ্ঞ পন্ডিত শঙ্কর পান্ডুরঙ্গের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠ সমাপ্ত করেন। বোঝা যায় কি গভীর অধ্যাবসায় ছিল তাঁর ভারতীয় ভাষা শাস্ত্রেব্র প্রতি।

এরই সাথে সাথে তিনি শরীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও পাঠ করেন। বরাহনগর মঠে থাকার সময় পড়েন ফিজিওলজি, প্যাথলজির বই। পড়েন ডারউইনের তত্ত্ব এবং পোস্তালাৎস্কির শিক্ষাতত্ত্ব। তিনি পড়ছিলেন দেশীয় ও বিদেশী সাহিত্য। উপন্যাস, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ যা পেতেন সবই পড়তেন। শেলির কবিতার সাথে পরিচিত ছিলেন তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই। শেলির প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্য ভাবনা, নৈব্যক্তিক বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি তাঁকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছিল। মিল্টনের কাব্য তিনি আবৃত্তি করতেন বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন। 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' নামক বক্তৃতায় তিনি কবিতার ভাষা প্রসঙ্গে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন - ক) ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে', খ) কালিদাসের সূচীভেদ্য অন্ধকার এবং গ)মিল্টনের 'No light but rather darkness visible'-এর। আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' কিংবা 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। পড়তেন বায়রণের কবিতা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 523 - 529
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন তার অন্যতম প্রিয় কবি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তো এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনের অধ্যক্ষ হেস্টির মুখে প্রথম ঠাকুরের কথা জানতে পারেন তিনি। বানিয়ানের 'প্রিলগ্রিমস প্রসেস'পড়া ছিল তাঁর। চার্লস দিকেন্স থেকেও মাঝে মাঝে একটানা দু-তিন পাতা মুখস্ত বলতেন তিনি। জুলে ভার্ন-এর কল্পবিজ্ঞানের গল্প তাঁকে আকর্ষণ করত প্রবল ভাবে।

অন্যদিকে যদি দেশীয় সাহিত্যের দিকে তাকাই দেখব, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। মাঝে মাঝেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানা কথোপকথনে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। মধ্যযুগের আখ্যান কবিদের মধ্যে কবিকঙ্কনকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হত। বরানগর মঠে থাকতে বিবেকানন্দ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নানা সংস্কৃত বই পড়ে বুঝিয়ে দিতেন। বইগুলির মধ্যে ছিল মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, কুমারসম্ভব, মেঘদুত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি।[৯]

তাঁর সময়য়ের বাংলা বই বিশেষ ছিল না। তবে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখালিখি হয়েছিল সে সম্মন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ভারতচন্দ্রের লেখা তাঁর অন্যতম প্রিয় ছিল। একাধিক সময়ে তিনি সদানন্দের সঙ্গে কৌতুক ছলে বিদ্যাসুন্দর উধৃত করতেন। পাশাপাশি এ কাব্যের মধ্যে থাকা দোষ ত্রুটির সমালোচনাও করতেন তিনি। বঙ্কিমের বই তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্রকে তিনি বঙ্কিমের বই পড়ার প্রেরণা দেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ' কাব্য তাঁর অন্যতন ভালোলাগার বই ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এর বিরূপ সমালোচনা করলেও বিবেকানন্দ সেই ভুল করেননি। বরং বলেন, 'মেঘনাধবধকাব্য বাংলা ভাষার মকুটমণি'। মাইকেলের বিদ্রোহী মনোভাব, ধর্মনিরোপেক্ষ স্বাদেশিকতা, স্বামীজীর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি শিষ্যকে বলেন, 'এর নতুন ছন্দ ওজস্বিনী ভাষা কি সাধারণে বুঝবে'? দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশি' থেকে হাসিতামাশার সময় একাধিক বার তিনি উদ্ধৃতি দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা সুদর্শন', কিংবা রামদাস সেনের 'ভারত রহস্য' ছিল তাঁর অন্যতম পছন্দের দুটি কাবিতার বই। গুরুভ্রাতা গিরিশের লেখা নাটক তাঁর বিশেষ ভালোলাগার জিনিস। তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নামক নাটকটি দেখে মুগ্ধ স্বামীজী বলেছিলেন,

> "বিল্বমঙ্গল, Shakespeare-এরও উপর গিয়াছে, এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনো পড়িও নাই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের লেখার সাথেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর লেখা দুটি গান স্বামীজী গেয়েওছিলেন। নিজের লেখা বই 'সঙ্গীত কল্পতরুতে তিনি এই গান সংকলিতও করেছিলেন।

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ব্যাক্তি জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনাকে মিলিয়েছেন। ভাবনা ও ভাষা-সাহিত্যের তুলনা করাটা তাই তাঁর কাছে ছিল খুবই সহজ কাজ। দীর্ঘ পড়াশোনা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন দর্শন ও শিক্ষার দিকে পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করার প্রযোজনীয়তা আমাদের ততটা নেই। বরং দেবার আছে অনেক কিছু। আমাদের ভাবনা পাশ্চাত্যকে বরং অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারবে। আর আমরা সাহিত্য বা দর্শনে নতুন কিছু করতে চাইলে অনায়াসে নিজেদের শিকড়ের দিকে তাকাতে পারি। ভারতীয় বেদান্তেই রয়েছে সর্ব শিক্ষার সারবত্তা। আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা অনায়াসেই এখান থেকে পেতে পারি। কিন্তু যদি এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সব বলা থেমে যায়নি। এর পরই তিনি দেওয়া নেওয়ার ধারণা দিলেন আমাদেরত। শোনালেন এমন কথা যা ক্রমাগত ধুঁকতে থাকা ভারতকে পারে অক্সিজেন জোগাতে। সেটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গ্রহণ। স্বামীজী মনে করতেন যার যেটা ভাল সেটা গ্রহণ করার মধ্যে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয়। বরং নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য এটা করা অবশ্য করণীয়।

(৩)

পাশ্চাত্যে অনেকটা সময় কাটিয়ে স্বামীজী বুঝেছিলেন আমাদের দেশে বিজ্ঞান চেতনার যথেষ্ট অভাব আছে। দেশের ভালোর জন্যই আমাদের এটা গ্রহণ করা উচিত। দেশে থাকা কালীন বিজ্ঞান নিয়ে স্বামীজী সেভাবে না ভাবলেও পাশ্চাত্যে গিয়ে বুঝতে পারলেন দুনিয়াটা অনেক এগিয়ে গেছে, তার সাথে পাল্লা দিতে গেলে আমাদের অবশ্যই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে। নিজে তিনি এই বিষয়ে প্রবল ভাবে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিকালো টেসলারের

কাছে যেতে চান। তাঁর জানতে চাওয়ার বিষয় ছিল, 'matter' বা পদার্থকে 'energy'তে বা শক্তিতে পরিণত করা যায় কিনা। স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

> "আগামী সপ্তাহে টেসলার কাছে আমার যাওয়ার কথা। গাণিতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি আমাকে হাতে কলমে করে দেখাবেন। তা যদি তিনি করে দেখাতে পারেন তাহলে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) একটা সুনিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"[১১]

বিবেকানন্দের এই চিঠির মধ্যে থেকে আমরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি — ক) স্বামীজী ধর্ম এবং বিজ্ঞানের দ্বন্দকে মানেছেন না, বরং বিজ্ঞান কে দিয়ে ধর্মের সত্যতাকে যাচাই করতে চাইছেন। নিজে একজন সন্ন্যাসী হলেও তিনি প্রমান করে দিয়েছেন কনোকিছুই বিচারের উর্দ্ধে নয়। এবং (খ) তিনি সেই জিনিসটার সন্ধান করছেন আগামী পৃথিবীতে যা হবে নিয়ন্ত্রক শক্তি, $E=mc^2$। অনুকে শক্তিতে কীভাবে রূপান্তরিত করা যায় এর সন্ধানে যিনি আগ্রহী তিনি যে বিজ্ঞানের বড় ভক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাশাপাশি তিনি জানতেন বিজ্ঞানের মধ্যেও ধর্মের মত গোঁড়ামি আছে। সবকিছুকেই বিজ্ঞান ব্যখ্যা করতে পারবে তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি তাই নিলেন অন্য একটা পথ, ভারতীয় সনাতন ধর্মকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন বিজ্ঞানের ভাষাতে। স্বামীজী এটা বলার পিছনে অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বললেন,

> "সুপ্রাচীন বেদান্ত দর্শনের উত্তুঙ্গ চিন্তার কাছে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলি মৃদু প্রতিধ্বনির মতো শোনায়।"[১২]

আসলে স্বামীজী চাইছেন বিজ্ঞান তাঁর বোধ দিয়ে বিচার দিয়ে, যুক্তি দিয়ে মেপে নিক বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব কতটা নিখুঁত। তিনি বেদান্তের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তাই বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি বললেন,

> "এটা পরিষ্কার যে বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে আধুনিক মানুষ জড়বাদী হয়েও অধ্যাত্মচিন্তার দিকে এগোতে পারেন। আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার কিন্তু যাঁরা কৌতূহলী তাঁরাও একটু চেষ্টা করলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে আজকের বিজ্ঞান যা বলছে, বেদান্ত সেসব সিদ্ধান্ত বহু যুগ আগেই নিয়ে বসে আছে।"[১৩]

প্রশ্ন উঠতে পারে এরও সাথে তাঁর শিক্ষা চেতনার সম্পর্ক কী? আর বেদান্তে এত আস্থা সত্ত্বেও কেন তিনি বিজ্ঞান চেতনাকে গ্রহণ করতে চাইলেন? কিন্তু এখানেই তাঁর উত্তর আছে। স্বামীজী চাইছেন একটা সামঞ্জস্য। কারণ তিনি তাঁর সমকালেই দেখতে পেয়েছিলেন শিক্ষার নামে যেটা চলছে আমাদের দেশে তাতে দেশের সমূহ ক্ষতি। বেদ ব্যাখ্যা করবার মত যোগ্য মেধা সকলের না থাকাটাই স্বাভাবিক। আর তাই দুর্বল ভারত হয়ে উঠবে আরো দুর্বল। বিবেকানন্দ যা চান না। ধর্মের বাইরেটাকে নিয়ে যদি শিক্ষা এগিয়ে যায় তাহলে মানুষ নিজের কাজকে ভুলবে আর মত্ত হবে গভীর আলস্যে কালযাপনে। তিনি ধর্ম বা বিজ্ঞানের থেকেও যেটা বড় করে দেখতে চান সেটা হল কর্ম। স্বামীজীর শিক্ষা ভাবনা কর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যুব সমাজকে জাগিয়ে নতুন শক্তিশালী ভারত গড়াই তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ব্যাক্তি জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনাকে মিলিয়েছেন। ভাবনা ও ভাষা-সাহিত্যের তুলনা করাটা তাই তাঁর কাছে ছিল খুবই সহজ কাজ। দীর্ঘ পড়াশোনা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন দর্শন ও শিক্ষার দিকে পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ততটা নেই। বরং দেবার আছে অনেক কিছু। আমাদের ভাবনা পাশ্চাত্যকে বরং অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারবে। আর আমরা সাহিত্য বা দর্শনে নতুন কিছু করতে চাইলে অনায়াসে নিজেদের শিকড়ের দিকে তাকাতে পারি। যা আমাদের দেশে প্রতিদিন ঘটছে। এখন তো আরো বেশি করে। কারণ এখন কে কত বেশি ইংরাজি বলে আর কম বাংলা বা মাতৃভাষা বলে শিক্ষার বিচার চলছে তার ভিত্তিতে। কিন্তু স্বামীজী তা চাইছেন না। তিনি বললেন,

> "আগে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও; যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর।"[১৫]

তাঁর শিক্ষা ভাবনায় মুখস্থ বিদ্যা জাহির করার কথা নেই, আছে ঠিকটাকে গ্রহণ করার উৎসাহ। তিনি মানেন,

> "আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্ত্বাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব সনাতন-প্রণালী-অবলম্বন করিতে হইবে।"[১৬]

কিন্তু তারই পাশাপাশি মানেন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন যতটা সম্ভব বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া। কারণ সনাতন শিক্ষার মধ্যে থাকা সত্যের গতির সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনার গতিকে যদি ঠিকভাবে মাশানো যায় তবে জন্ম নেবে এক কর্মবীর ভারত। দেশের মঙ্গলের জন্যই এই শিক্ষা নীতি কাম্য। কোনো একটাকেই যথার্থ না ভেবে যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে ঠিক ভুলের যাচাই করার এ যেন এক অনন্য শিক্ষাতত্ত্ব।

Reference:

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (খণ্ড ৯), ২২তম পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১০, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ১০৬
২. বাণী ও রচনা (খন্ড ৯), পৃ. ১৬৪
৩. বাণী ও রচনা (খন্ড ৯), পৃ. ১৬৫
৪. উদ্বোধন পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, পৃ. ২৬৪
৫. স্বামী, গম্ভীরানন্দ, যুগ নায়ক বিবেকানন্দ (১ম খন্ড), সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৪৭
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, পৃ. ৫৮
৭. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (২য় খন্ড), স্বামী সারদানন্দ, ২৭তম পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১১, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ১৮৭-১৮৮
৮. বিবেকানন্দ, স্বামী, পত্রাবলী, ১৫তম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০০৯, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ২
৯. মহিমা তব উদ্ভাসিত, সম্পাদনাঃ প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, ৩য় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৮, শ্রীসারদা মঠ, পৃ. ৪০৩
১০. ঘোষ, অজিত, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৫০
১১. বিবেকানন্দ, স্বামী, পত্রাবলী, বিবেকানন্দ, ১৫তম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০০৯, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৪৩
১২. মহিমা তব উদ্ভাসিত, সম্পাদনা - প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, ৩য় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৮, শ্রীসারদা মঠ, পৃ. ৩২৭
১৩. মহিমা তব উদ্ভাসিত, পৃ. ৩২৭
১৪. বাণী ও রচনা (৯ম খন্ড), পৃ. ১০৭
১৫. বাণী ও রচনা (৫ম খন্ড), ২২তম পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১০, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৪৪
১৬. বিবেকবাণী, ১৫তম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ১৫-১৬